

বিশেষ সাক্ষাৎকার > রাশেদা কে চৌধুরী

# শিক্ষাপদ্ধতির সার্বিক মূল্যায়ন দরকার

শুধু শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকরাই নন, শিক্ষাবিদরাও অনেক দিন ধরেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এবারও সেই দাবি উপেক্ষা করে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কোচিং-গাইড বইয়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হলেও বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন নেই। শিক্ষার মান নিয়েও রয়েছে অনেক কথা। সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা, চলমান সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি, এর ব্যবহারিক নানা দিক, জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নসহ নানা বিষয় নিয়ে কালের কণ্ঠের সঙ্গে কথা বলেন শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শারমিনুর নাহার

**কালের কণ্ঠ :** দীর্ঘদিন ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার দাবি তোলা হচ্ছে। এর যৌক্তিকতা কতটুকু?

**রাশেদা কে চৌধুরী :** সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার দাবি এসেছে মূলত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দিক থেকে। বর্তমান পদ্ধতিতে একজন শিক্ষার্থী কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলেও তাকে শুধু একটিতে ভর্তি হতে হয়। ফলে অন্য যে জায়গাগুলোতে সে সুযোগ পায় সেগুলো নষ্ট হয়। হয়তো একেবারে নষ্ট হয় না, অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পরে ডাকা হয়। এই অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির সুযোগ পাওয়া নিয়েও নানা প্রশ্ন তৈরি হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় পর পর পরীক্ষা নেয়। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পরণ্ড চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে শিক্ষার্থীকে এক ধরনের দৌড়ের মধ্যে থাকতে হয়। শুধু শিক্ষার্থী নয়, অভিভাবকদেরও নানা ব্যক্তিগত পোহাতে হয়। আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলে অনেক বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার অব্যাহত হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানত উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা পড়ে। এই ভর্তি সংক্রান্ত জটিলতা তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা তৈরি করে। তাই সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা হলে কিছু সমস্যার অন্তত সমাধান হবে।

**কালের কণ্ঠ :** একজন শিক্ষার্থী এসএসসি ও এইচএসসিতে 'এ প্লাস' পেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পেরে উঠেছে না। এর কারণ কী?

**রাশেদা কে চৌধুরী :** এ সমস্যাটা একটু ভেতর থেকে আলোচনা করতে চাই। আমরা আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে যেভাবে পরীক্ষানির্ভর করে ফেলেছি, এটা তারই একটা সাইড ইফেক্ট বলা যায়। পরীক্ষায় পাস করলে পরবর্তী ধাপে যাবে, সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা হলো কি না, আশ্রয় সৃষ্টি বিষয়টি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জিত হলো কি না, জীবিকার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে কি না ইত্যাদি তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। পরীক্ষা থাকবে না এই কথাটি কিন্তু বলছি না। শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে নিয়মিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন অবশ্যই থাকতে হবে। তবে শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষককে যখন ৬০ থেকে ৭০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠান করতে হয় তখন তাঁর পক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষকরাও 'কোচিং' করতে হবে, গাইড বই পড়তে হবে—এমন কথা বলে থাকেন। আমাদের ব্যাপক শিক্ষক সংকট আছে, বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে। অনেক ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের সংকট এটিকে আরো জটিল করে তুলেছে।

শ্রেণিকক্ষের ভেতরে যদি শিক্ষার্থীর পঠন-পাঠন যথাযথ না হয়, তাহলে শুধু পরীক্ষা আর পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীরা কতখানি জ্ঞান অর্জন করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। এ ছাড়া সরকারকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, শিক্ষামন্ত্রীও স্বীকার করেছেন যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার, বিশেষ করে পরীক্ষাপদ্ধতির একটা সংস্কার দরকার। শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে একটা প্রশ্নব্যাংক করার প্রস্তাব এলো। দেখা গেল সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ যথাযথ হয়নি। ফলে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ সুফল পাওয়া এখনো সম্ভব হয়নি। এ পদ্ধতিতে গৃহশিক্ষক, গাইড বই বা কোচিংয়ের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়। শিক্ষকরা যদি শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠনে মনোযোগী থাকেন, তাহলে পাঠ্যপুস্তকই যথেষ্ট। এখানে এটাও বোঝা প্রয়োজন যে শিক্ষার্থীরা গাইড বইয়ের দিকে কোন বোকে? কারণ নমুনা প্রশ্নোত্তর। যদি মূল বইতে পাঁচটি নমুনা প্রশ্ন দেওয়া থাকে, গাইড বইয়ে দেওয়া থাকে ২০টি। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রায়ই গাইড বইয়ের দিকে বোকে। শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষের চালিকাশক্তি। আমাদের শিক্ষকদের ওপর অনেক কাজের চাপ থাকে। প্রথম হলো বেশি শিক্ষার্থীর চাপ, দ্বিতীয়ত, পড়ালেখার সময় কম এবং খুব দ্রুত ও বেশি সংখ্যক পরীক্ষা। পঞ্চম শ্রেণি সমাপনী, অষ্টম শ্রেণি সমাপনী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। অষ্টম শ্রেণি সমাপনীর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণি থেকেই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সব কিছু এখন পরীক্ষাভিত্তিক হওয়ায় সর্বত্র একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। জাতীয় পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষার্থীর জ্ঞান মূল্যায়নের এই পদ্ধতি সৃজনশীল পদ্ধতিকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। এটা সৃজনশীল পদ্ধতির সমস্যা নয়। সৃজনশীলকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এটি যে প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তার দুর্বলতা।

**কালের কণ্ঠ :** এ ব্যাপারে নতুন যে কমিটি করা হলো তারা কী কী কাজ করবে?

**রাশেদা কে চৌধুরী :** এই কমিটি প্রশ্নব্যাংক ছাড়াও পরীক্ষার উত্তরপত্রের অভিন্ন মূল্যায়নের সুপারিশ করেছে। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে বৈষম্য হয়, এটি আমরা দেখেছি। একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করে দেখা গেছে যে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন আসে। এ জন্য অভিন্ন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন জরুরি। এ ছাড়া যারা পরীক্ষক থাকবেন, তাদের যাত্রে অভিন্ন দক্ষতা, অভিন্ন প্রশিক্ষণ থাকে, সেটাও দেখা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে সব বোর্ডের প্রশ্নের ধরন ও মান এক হতে হবে। এটা না হলে শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিশ্বাস করা হবে। এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে দূর করার কাজগুলো শুরু করেছে। পরীক্ষকদের সম্মানীয় যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষক হিসেবে যাদের যাচাই-বাছাই করা হয় তাঁরা দক্ষ হলেও অনেক সময় পরীক্ষক হতে চান না। দেখা যায় তাঁরা তিন বা চার ঘণ্টা যদি কোচিং করান সেখানে যে অর্থ পাবেন, পরীক্ষার খাতা দেখতে পুরো সপ্তাহ ব্যয় করলেও সে অর্থ আসে না। এই শিক্ষকদের পেছনে সরকারি বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু আমরা সেই বিনিয়োগের



শিক্ষাপদ্ধতির একটি সার্বিক মূল্যায়ন দরকার। এত বেশি পাবলিক পরীক্ষা কেন আমাদের প্রয়োজন, তা বোধগম্য নয়। সারা দেশে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু সমাপনী পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে কোচিং বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, তাতে পরিবারগুলোকে হিমশিম খেতে হয়। অথচ আইন অনুযায়ী আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক! আরো দুঃখজনক বিষয় হলো, স্বাধীনতার পর আমরা প্রথম একটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি পেয়েছিলাম ২০১০ সালে। এটা সংসদে গৃহীত হয়েছিল

তেমন সুফল পাচ্ছি না। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম নিয়মিত পরিমার্জন ও সংশোধন করা প্রয়োজন। ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবালসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে এগুলো পর্যালোচনা করার জন্য কমিটি তৈরি করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, তারা প্রধানত দুটি জায়গায় পর্যালোচনা করবে। প্রথমত, পাঠ্যপুস্তক সুখপাঠ্য, সহজপাঠ্য ও যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রাখা। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী পর্যায়ে যেটা শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক হবে এমন বিষয় জানা, যেমন প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা পাসের পর যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে যায় তখন শিক্ষার্থীরা একটা বিশাল বইয়ের ভারের মধ্যে পড়ে। এটা প্রয়োজনমূলক কমানো হবে।

**কালের কণ্ঠ :** সাতটি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার পর থেকেই কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। একাডেমিক ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ছে। এসব নিয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনও করছে। অধিভুক্তির বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

**রাশেদা কে চৌধুরী :** লাভ বা ক্ষতি হিসাব করার আগেই তো সমস্যা তৈরি হয়ে গেল। ঢাকা নগরীর সব সরকারি কলেজ, বলা যায় এগুলো সবই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বা সাত কিলোমিটার এলাকার মধ্যে। এই কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা একটা ইতিবাচক দিক। মূলত ব্যবস্থাপনাপ্রণালীর কারণে বর্তমান সমস্যা তৈরি হয়েছে। তারা নিজেরা শুরুতেই জালাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলো সমাধান করে নিলে, সমস্যা এতটা প্রকট হতো না। এখন শিক্ষার্থীরা যে পাঁচটি দাবিতে আন্দোলন করেছে সেগুলো অবশ্যই যৌক্তিক। তবে এখানে একটি কথা না বললেই নয়, জুলাই মাসে যখন আন্দোলন শুরু হয় তখন তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চড়াও হয়। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। তখন সিদ্দিকুর নামে এক শিক্ষার্থীর চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এবারও তারা যে দাবি তুলেছে, যেমন মামলা প্রত্যাহার, চতুর্থ বর্ষের ফল প্রকাশ, একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার রুটিন দেওয়া এবং কলেজগুলোর স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট তৈরি করা—এগুলো অভ্যন্তরীণ যৌক্তিক। দ্রুত বসে এসবের সমাধান করা প্রয়োজন। আমি শিক্ষার্থীদের সাধুবাদ দেব যে তারা কোনো ভাঙচুর করেনি, শান্তিপূর্ণভাবে রাস্তা অবরোধ

করে দাবি জানিয়েছে; যদিও তাদের অবরোধের কারণে সেদিন রাস্তাঘাটে প্রচণ্ড যানজট হয়েছে। কিন্তু তাদের সমস্যার সমাধান হওয়াও জরুরি।

**কালের কণ্ঠ :** পাবলিক পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা, চাকরির পরীক্ষা ইত্যাদিতে প্রায়ই প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। এগুলো রোধের কার্যকর উপায় কী?

**রাশেদা কে চৌধুরী :** প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা জনমনে এক ধরনের অনাস্থা তৈরি করেছে। প্রথম অবস্থায় এটা প্রশাসন বা মন্ত্রণালয় স্বীকার করতে দ্বিধা করেছে। যদি প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া হতো, তাহলে ঘটনা এত দূর গড়াই না। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে প্রযুক্তির একটি সম্পর্ক আছে। তাই অভিজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের ডেকে বিষয়টা কিভাবে সমাধান করা যায় তার একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা দরকার। প্রশ্ন ফাঁসের আরেকটি খারাপ দিক হলো, নৈতিকতাবোধের কারণে প্রথমে বেশির ভাগ মা-বাবা এটার সঙ্গে জ্বলেন না; কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তাঁরা দেখেন যে অন্যান্য সন্তানরা ক্রমাগত যুক্ত হচ্ছে তখন কিছুটা হলেও এটার প্রতি অনেকেই বুকে যান। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করার জন্য অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আমার জানামতে, দু-একজন বিশেষজ্ঞ প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে বাস্তবায়নযোগ্য বিকল্প তৈরির জন্য কাজ করছেন। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রহণযোগ্য পন্থা নিতে হবে। অন্যদিকে অপরাধীর বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যখনই অপরাধ তখনই যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ সমস্যাগুলো কিছুটা হলেও নির্মূল হবে। এক্ষেত্রে ইভ টিজিং রোধ করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কা গ্রহণ করার কারণেই কিন্তু ইভ টিজারদের চিহ্নিত করা ও সমস্যার অনেকখানি সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

**কালের কণ্ঠ :** প্রায়ই শোনা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান স্নেহ-গেছে—আপনার কী অভিমত?

**রাশেদা কে চৌধুরী :** এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, শিক্ষার সার্বিক সমস্যা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত ভালো মানের শিক্ষার্থী নিয়ে কাজ শুরু করে। কিন্তু অনেক সময় তাদের সঠিক পরিচর্যা, বিশেষ করে গবেষণাভিত্তিক উন্নয়ন তেমন একটা হয় না। দ্বিতীয়ত, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণীয় শিক্ষকদের অনেকেই দলীয় পরিচয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের মনোযোগ অনেক সময় খণ্ডিত হয়ে যায়। তৃতীয়ত, এখন অভিযোগ যদিও কিছুটা কমেছে, তবু শিক্ষকরা প্রায়ই উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে গেলে ফিরে আসেন না বা ফিরে আসতে দেরি করেন। এসবের বাইরে আরেকটি জরুরি বিষয় হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক গবেষণা। কিন্তু সেই গবেষণা ব্যাহত হয় পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে; কিন্তু শিক্ষার বাজেট সে হারে বাড়ছে না। টাকার অঙ্কে বাড়ছে মনে হলেও শিক্ষার্থীপ্রতি বিনিয়োগ কমেছে। আমরা কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে বাজেট বাড়িয়ে সুফল পেয়েছি। পাটের জিনিসতত্ত্ব আবিষ্কার হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও গবেষণার জন্য বাজেট বাড়ানো খুবই জরুরি।

**কালের কণ্ঠ :** শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না কেন?

**রাশেদা কে চৌধুরী :** শিক্ষাপদ্ধতির একটি সার্বিক মূল্যায়ন দরকার। এত বেশি পাবলিক পরীক্ষা কেন আমাদের প্রয়োজন, তা বোধগম্য নয়। সারা দেশে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু সমাপনী পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে কোচিং বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, তাতে পরিবারগুলোকে হিমশিম খেতে হয়। অথচ আইন অনুযায়ী আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক! আরো দুঃখজনক বিষয় হলো, স্বাধীনতার পর আমরা প্রথম একটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি পেয়েছিলাম ২০১০ সালে। এটা সংসদে গৃহীত হয়েছিল। সেই শিক্ষানীতিতে বলা আছে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। এর আগে পাবলিক পরীক্ষা নয়, তবে স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা হতে পারে। সর্বজনগ্রাহ্য এত বড় একটা শিক্ষানীতি পেয়েও আমরা এ নীতির প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত দিকনির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যাদের আগ্রহ নেই তাঁরা বলে থাকেন, এটা করতে অনেক সমস্যা, অনেক জটিলতা। ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল—এই সাত বছরেও আমরা সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারলাম না, সমস্যা সমাধানের জন্য একটা রোডম্যাপ করতে পারলাম না যে কবে নাগাদ এটা বাস্তবায়ন করতে পারব। এটা দুঃখজনক।

**কালের কণ্ঠ :** বর্তমানে যে শিক্ষাকাঠামো আছে সেখানে কোন দিকটি অবহেলিত হচ্ছে বলে মনে করেন?

**রাশেদা কে চৌধুরী :** আমি মনে করি, সব শিক্ষার্থীর উচ্চতর সাধারণ শিক্ষায় যাওয়ার দরকার নেই। অষ্টম শ্রেণির পর চাহিদার ভিত্তিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। এখানে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এ জন্য আরো যা করা দরকার তা করতে হবে। যেমন তাদের জন্য আবাসন ও যাতায়াত সুবিধা দিতে হবে। অনেকে কারিগরি শিক্ষা নিয়ে এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগে, এটা দূর করতে হবে। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ।

**কালের কণ্ঠ :** আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

**রাশেদা কে চৌধুরী :** কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ।